লোক প্রশাসন সাময়িকী
একাদশ সংখ্যা, মার্চ ৯৮, চৈত্র ১৪০৪

বস্তি উন্নয়ন ঃ সমস্যা ও সমাধান (বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত)

সৈয়দ শামসুল আলম *

১.০ ভূমিকা

একজন কর্মক্ষম মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তার কর্মসংস্থান। গ্রামের তুলনায় শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী হওয়ায় শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে কাজের জন্য শহরে ছুটে আসে। বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম একটি দরিদ্র দেশ। এখানে একমাত্র কৃষি, ক্ষুদ্র পেশা ও কুটির শিল্প ছাড়া তেমন কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় মানুষ প্রতিদিন গ্রামাঞ্চল থেকে কাজের অন্বেষণে স্রোতের মত শহর অভিমুখে ছুটে আসে।

এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভাব, দারিদ্র ও বেকারত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে গ্রাম থেকে দিনমজুর, ক্ষুদ্র পেশার মানুষ, এমনকি ছোট কৃষক পরিবার; যে তার আয়ের অর্থ দ্বারা সংসার চালাতে ব্যর্থ হয়, সে মানুষটিও একসময় গ্রাম ছেড়ে পরিবারসহ কাজের অন্বেষণে শহরে চলে আসতে বাধ্য হয়।

প্রাণরক্ষার দায়ে এবং একটু উন্নত জীবন যাপন ও কর্মসংস্থানের তাগিদে গ্রাম থেকে মানুষের শহরে আসার ঘটনা নতুন নয়। নগরায়ন বৃদ্ধি পাবার পর থেকে বৎসরের পর বৎসর এই প্রবণতা ও প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে, একবার যারা সবকিছু ছেড়ে শহরে এসে পড়ে, গ্রামে ফিরে যাওয়ার পথ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। অসহায়, সম্বলহীন এই মানুষগুলো শহরে এসে প্রথমে রেলষ্টেশনে, পরে ফুটপাতের পাশে একটি খালি জায়গায় অথবা পতিত জায়গায় মাথা গোঁজার জন্য একটি অতি সাধারণ ঝুপড়ি তৈরী করে শুরু করে বস্তিবাসী জীবন।

---

* পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

কিন্তু শহরে এসে প্রথমেই এ মানুষগুলো যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে তা যেমন করুণ তেমনি মর্মান্তিক। শহরেও কাজ নেই, থাকার জায়গা নেই, আহার সংগ্রহের উপায় নেই। অবস্থাটি এমন যে, গ্রাম তাদের ধরে রাখতে পারেনি, শহরও তাদের ধরে রাখতে চায়না। গ্রাম থেকে আসা এই ছিন্নমূল মানুষের জীবন নিয়ে এই যে বিড়ম্বনা, এই যে, অসহায়ত্ব তার স্বরূপ বর্ণনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে শহরে বস্তি সৃষ্টির প্রধান কারণ ও বৈশিষ্ট্য সমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বস্তি সমস্যা নিরসনে আন্তর্জাতিক ভাবে যে সকল প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে বা এখনও অব্যাহত রয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে; বিশেষ করে ঢাকাসহ প্রধান চারটি মহানগরীর বস্তি সমস্যা এবং এর প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে এই সমস্যা নিরসন কল্পে কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রণয়নে সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী ও আধা সরকারী গবেষণা প্রতিবেদন থেকে তথ্যাদি পরিবেশন করা হয়েছে।

২.০ শহরে বস্তি

(ক) বস্তি ঃ সৃষ্টির কারণ

বিশ্ব নগরায়নের অগ্রগতি ১৯৯৪ (World Urbanization Prospect : 1994) শীর্ষক জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে "The number of people who live in urban areas expected to double to more than 5 billion people between 1990 to 2025. 90 percent of this growth will occur in the countries of developing world" এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, "Roughly 1,50,000 people are added to the urban population of developing countries every day" এই বিপুল সংখ্যক লোক শহরে এসে তাদের আর্থিক সংগতি মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করে থাকে।

যে সকল কারণে গ্রামের মানুষ শহরমুখী হচ্ছে এবং শহরে বস্তির সৃষ্টি হচ্ছে, তার মধ্যে নিম্নোক্ত কারণসমূহ অন্যতম ঃ

শহরগুলো গ্রামের মানুষকে তুলনামূলকভাবে সামগ্রিক ও আর্থিক সুযোগ প্রদান করে থাকে। "Cities are growing because they provide, on average, greater social and economic benefits than do rural areas" একই সাথে খাবারের পানি, স্বাস্থ্য সুবিধা, পয়ংপ্রণালী, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং শিক্ষার সুযোগ মানুষকে শহরমুখী করেছে। যদিও এই সুযোগগুলো বস্তিবাসীদের মধ্যে নেই বললেই চলে।

তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলোতে রয়েছে ফরমাল ও ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করার সুবিধা। সম্প্রতি বাংলাদেশে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে মহিলাদের কাজের সুযোগ গ্রামের গরীব ও নিম্নবিত্ত মহিলাদের পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী শহরমুখী করে তুলেছে। এই সুযোগ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ইনফরমাল সেক্টরে যে কোন রকম ক্ষুদ্র পেশায় নিয়োজিত হচেছ। এলজিইডির একটি সীমক্ষায় দেখা গেছে, "A substantial number of Bangladeshi's urban poor make their living through subsistence activities or informal jobs such as garbage collection, domestic help and other odd jobs. Informal jobs makeup an estimated 75 percent of urban employment in Bangladesh."

উপরন্ত গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। পৃথিবীর সর্বত্রই এটা চালু রয়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীর বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে "Migrants are not pulled toward cities by the prospect of jobs and higher income, they are also pushed-out of rural areas by such factors as poverty, natural disaster, lack of work and agricultural land and famine."

সর্বোপরি উন্নয়নশীল বিশ্বে শহরের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লোক মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ উৎপাদন করে থাকে। এদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ লোকই নিম্ন পেশায় নিয়োজিত। "All these push and pull factors are not only responsible for creating slums in the city, but also mounting air pollution generating urban wastes, congesting city street, increasing water and sanitation problems."

(খ) বস্তির বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর উন্নয়শীল দেশ সমূহের প্রতিটি শহরে অনাগত এই বিপুল সংখ্যক জনগণকে বাধ্য হয়ে বস্তি ও বাস্তুহারা পরিবেশে বসবাস করতে হয়। তবু তারা শহরেই থাকে, কারণ শহর অন্তত জীবন ধারণের সুযোগ দেয়, যে কোন কাজের সুযোগ দেয় এবং সামান্য হলেও আয়ের সুযোগ দেয়। এই কাজ যত কষ্টেরই হোক এবং আয় যত সামান্যই হোক, তা তাদের পূর্বেকার ঠিকানা গ্রামের চেয়ে ভাল, এটাই শহরের বাস্তবতা। এছাড়া শহর একজন নবাগতকে ক্রমশ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উন্নতির পথ করে দেয়। কারো জন্য এই উন্নয়নের প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদী, কারো জন্য স্বল্প মেয়াদী, কারো কারো জন্য অবশ্য এই উন্নয়ন তেমন বাস্তব চিত্র হয়ে ওঠে না।

ব্যক্তিগত উন্নয়ন ছাড়াও বস্তিবাসী তৃতীয় বিশ্বের যে কোন মহানগরের অর্থনৈতিক কাঠামোর শক্তিশালী অংশ। তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও অবদান অনস্বীকার্য। বস্তিবাসী তথা শহরের দরিদ্ররা অধিকাংশই স্ব-নিয়োজিত এবং শহরের ''ইনফরম্যাল সেক্টরে' কর্মরত।

তৃতীয় বিশ্বের শহরে বস্তি ও বাস্তহারা কলোনী গড়ে উঠে প্রায় যে কোন এলাকাতেই। তবে আমাদের দেশে শহরের যে সব জায়গায় কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী, প্রান্তিক ও নীচুমানের জমি যেখানে ভাড়া কম, যেখানে অব্যবহৃত সরকারী জমি পড়ে থাকে, সে সব এলাকাতেই বস্তি গড়ে উঠে। ঢাকা শহরেও এই চিত্র দেখা যায়। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির উপর ভাড়াটে ঘরের বস্তি গড়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে সরকারী/আধাসরকারী এমনকি কোন কোন শহরে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির উপর অবৈধ/অননুমোদিত বাস্তহারা কলোনী (বা স্কোয়াটার্স সেটেলমেন্ট) গড়ে উঠে থাকে। শহরে বস্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে প্রধানত বৈধ এবং অবৈধ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে শহরে গড়ে উঠা বস্তি অধিকাংশই অবৈধ। কারণ যে বাস্তহারা লোকটি জীবিকার উদ্দেশ্যে শহরে আসে তখন বৈধ বস্তিতে বসবাস করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা প্রদান করার মত আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তাকে আশ্রয় নিতে হয় সরকারী, আধা-সরকারী পরিত্যক্ত স্থানে।

বস্তি বৈধ হোক বা অবৈধ বাস্তহারা হোক, প্রধানত এসব এলকায় ভৌত পরিবেশের অতি নিম্নমান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নানা রকম অসামাজিক কার্যকলাপের সম্ভাব্য ক্ষেত্র হিসেবে শহরের বস্তি/বাস্তহারা এলাকাগুলোকে প্রায় সব দেশেরই সরকারকে চিন্তিত করেছে ও বস্তি সমস্যা নিরসন সম্পর্কে নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণে কম বেশী উৎসাহিত করেছে। বিশেষ করে বিগত তিন দশকে বস্তি সমস্যা নিরসন নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণ অনেকটা জোরদার হয়েছে। এতে জাতিসংঘের মানব বসতি সংক্রান্ত সংস্থা 'হ্যাবিটাট' ও ইউ এন, এস্‌কাপ বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ প্রবন্ধে বস্তি বলতে এমন এলাকা বুঝানো হয়েছে যেখানে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি একরে ৩০০ জনের অধিক এবং প্রতি কামরায় বসবাসকারীদের ঘনত্ব ৩ এর অধিক। যেখানে গৃহ নির্মাণের উপকরণের মান খুবই নীচু প্রধানত ঝুপড়ি ও কাঁচাঘর। পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্তা নেই। নেই কোন পাকা রাস্তা, নেই বিদ্যুৎ বা জ্বালানী সরবরাহের ব্যবস্থা। যেখানে মূলত ছিন্নমূল দরিদ্র লোকের বাস।'

" The term Urban squatting means illegal or legal occupation of urban land. Such occupation may be structural or non-structural and occupants of such lands are known as Squatters or Slums. These settlements are also known as various other names in different countries mainly based on local terms. In Bangladesh, India and

Pakistan as Bustees, Jhupris and Jhuggis. In Mexico it is known as jacoles, in Panama as Ranchos, in Brazil as Mooambas, in Sao Paulo and Reo-de Janeroe as Farvelos and in Peru as Barridas. [১]

৩.০ বাংলাদেশের নগরায়নে বস্তি সৃষ্টির প্রবণতা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম স্বল্প নগরায়িত জনসংখ্যার দেশ, কিন্তু সাম্প্রতিককালে এখানে নগর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি উচ্চ বৃদ্ধি হার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে (সারণি-১)। তাছাড়া, দেশের মোট জনসংখ্যার বিপুলতার কারণে অপেক্ষাকৃত কম নগরায়ন হার সত্ত্বেও দেশের মোট নগরায়িত জনসংখ্যার পরিমাণ আদৌ কম নয়। বর্তমানে (১৯৯৭) বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা অনুমান করা হয় প্রায় ১২৪ মিলিয়ন। নগরায়িত জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ২০ ভাগ, অর্থাৎ মোট নগর জনসংখ্যা প্রায় ২৪ মিলিয়ন। বিগত দুই দশকে নগর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক গড় প্রায় ৭ শতাংশ। অন্যদিকে এই সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক শতকরা ৩ এরও কম। নগরায়নের এই বৃদ্ধির হার সম্প্রতিকালে পৃথিবীর অন্য কোন বৃহৎ জনসংখ্যার দেশে পরিলক্ষিত হয় নাই।[২] জনমিতিকগণ আশা করছেন, বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কিছুটা হ্রাস পাবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ২০০০ সালে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে ৪.৮%, ২০১০ সাল নাগাদ ৪.০% এবং ২০১৫ সাল নাগাদ ৩.০%। এভাবে কমতে থাকলেও উল্লিখিত সালগুলিতে বাংলাদেশে নগরায়নের মাত্রা ও জনসংখ্যার পরিমাণ যথেষ্ট বেশী হবে। ২০০০ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৬.০% হবে নগরবাসী, অর্থাৎ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা যদি তখন ১৪১ মিলিয়নও হয়, তাহলে নগর জনসংখ্যা হবে ৩৭ মিলিয়ন, ২০১০ সালে এই নগরায়ন হার হবে ৩৩.% এবং মোট নগর জনসংখ্যা হবে ৫৭ মিলিয়ন, ২০২৫ সালে নগরায়ন হার হবে ৪৫% এবং নগর জনসংখ্যা প্রায় ৮০ মিলিয়ন।[৩]

সারণি-১ ঃ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নগরায়নের ধারা

দেশের নাম	১৯৯১ সালে মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	নগরায়নের হার	নগর জনসংখ্যার বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার
বাংলাদেশ	১১১	২০	৬.০০
ভারত	৯৭৭	৩১	৫.১
পাকিস্তান	১১০	৩৪	৫.৫
শ্রীলংকা	২১	২৩	৪.৯
ফিলিপাইন	৬৮	৫১	৪.২
ইন্দোনেশিয়া	২০৬	৩৩	৫.৬
থাইল্যান্ড	৬৪	২৭	৫.১

উৎস ঃ বিশ্ব ব্যাংক ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯১।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নগরায়নের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগের স্বল্পতা, দরিদ্রতার প্রবণতা বৃদ্ধি, শিক্ষিত-অশিক্ষিত যুবকের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ; যেমন নদী ভাঙ্গণ, উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং খরা ইত্যাদি। এই সকল বেকার লোকজন অধিকাংশই দেশের বড় বড় শহরে কর্ম-অন্বেষণে ছুটে আসছে। এ কারণে দেখা যায় যে, বর্তমানে একমাত্র ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা শহরেই বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যার ৪৩ ভাগ মানুষ বসবাস করছে। এদের মধ্যে রাজধানী ও বৃহত্তম শহর ঢাকার তুলনামূলক আয়তন আরো বিসদৃশ। ১৯৮৯ সালে মোট নগর জনসংখ্যার (২২ মিলিয়নের) প্রায় ৩২ ভাগই হচ্ছে একমাত্র ঢাকা শহরের অধিবাসী। বিগত দুই দশকে ঢাকা মহানগরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অত্যন্ত দ্রুতহারে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৮%-১০% হারে। ১৯৭৪ সালে এই মহানগরীরর লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ১,৬০০,০০০, ১৯৮১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,৪০০,০০০ এবং একই সীমানাভুক্ত শহর এলাকার জন্য এই সংখ্যা বর্তমানে (১৯৯৭) সম্ভবত ৯ মিলিয়ন। ২০০০ সালে ঢাকার লোকসংখ্যা হবে ১০ মিলিয়নের উপর, ২০১০ সালে ১৫ মিলিয়ন এবং ২০২৫ সালে প্রায় ২০ মিলিয়ন।[৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর আরবান ষ্টাডিজ এর একটি সীমক্ষায় দেখা গেছে, ঢাকা মহানগরে সম্প্রতিকালে যে বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছ তার অধিকাংশই দেশের বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছে। অর্থাৎ ঢাকা মহানগর এখন প্রধানত বহিরাগতদের শহর। এখানকার প্রায় ৬০ ভাগ মানুষেরই জন্ম এই শহরের বাইরে। ঢাকার সাম্প্রতিক গ্রাম-শহর স্থানান্তরকারীর বেশীর ভাগই দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। এরা প্রধানত রাজধানীতে এসেছে অর্থনৈতিক কারণে, জীবিকা অন্বেষার তাগিদে। গ্রামাঞ্চলের দুঃসহ দারিদ্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য প্রতিকূল সম্ভাবনা তাদেরকে ঢাকামুখী করেছে। এ জাতীয় প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয় কম বেশী বর্তমান উন্নয়নশীল বিশ্বের সকল দেশেই।[৫]

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার ঢাকায় প্রবেশের ফলে শহরের গৃহসংস্থান পরিস্থিতির উপর মারাত্মক চাপ পড়ে। কোন অবস্থাতেই সরকারী বা বেসরকারীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বা গ্রহণযোগ্য মানের গৃহসংস্থান সম্ভব হয় না। গৃহ নির্মাণ ও সরবরাহ, চাহিদা বা প্রয়োজনের তুলনায় মারাত্মকভাবে পিছিয়ে থাকে। বিশেষ করে সরকারী উদ্যোগে গৃহায়ন যে কতটা অকিঞ্চিৎকর, তা প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর একটি সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন ''ঢাকায় কর্মরত ১লক্ষ ১৫ হাজার সরকারী কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১২ হাজার সরকারী কর্মচারী কলোনী বা বাসা পাইয়াছে। এই ১২

হাজারের মধ্যে ৭০ ভাগই কর্মকর্তা পর্যায়ের। নিম্ন বেতনের কর্মচারীদের বাসার ব্যবস্থা খুবই নগণ্য। তবে ওয়াপদা, ওয়াসা, পি. ডব্লিউ. ডি, সড়ক জনপথ, রেলওয়ে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আবাসিক সুবিধা রহিয়াছে। সে ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগের বেশী নহে।" বেসরকারী খাতে বা প্রাইভেট সেক্টরেও গ্রহণযোগ্য মান সম্পন্ন গৃহ-নির্মাণ খুবই অপর্যাপ্ত। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সাধারণ নাগরিকরাও আবাসন সমস্যার শিকার। নিম্নবিত্ত ও দরিদ্রদের আবাসন সমস্যা আরো জটিল এবং গৃহায়নের এই পরিস্থিতির একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বা ফল হচ্ছে শহরে দ্রুত গতিতে বেড়ে ওঠা অসংখ্য বস্তি (স্লাম) ও বাস্তুহারা এলাকা (স্কোয়াটার্স)।[৬]

এই পরিস্থিতি শুধু ঢাকা বা বাংলাদেশের একক বৈশিষ্ট্য নয় বরং আধুনিক নগরায়নের এটা হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিরোধ্য ধারা, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে এমনকি অধুনা দ্রুতহারে উন্নতিশীল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহেও প্রায় একই পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এসব দেশের রাজধানী তথা বৃহত্তম শহরগুলিতে তাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০-২৬ শতাংশ জনগণ বস্তি ও বাস্তুহারা এলাকার অধিবাসী। এর মধ্যে বাস্তুহারা এলাকায় থাকে ৫.০%। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা মহানগরীর বর্তমান (১৯৯৭) মোট জনসংখ্যা প্রায় ৯ মিলিয়ন, বস্তিবাসী ও বাস্তুহারা জনসংখ্যা প্রায় ৪ মিলিয়ন এবং অবৈধ বস্তির জনসংখ্যা বা বাস্তুহারাদের (স্কোয়াটার্স) সংখ্যা প্রায় ০.৩ মিলিয়ন।[৭]

৪.০ বস্তি সমস্যা নিরসনে প্রচেষ্টা

উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক বড় শহরেই বস্তি ও বাস্তুহারাদের সমস্যা প্রকট। এ সম্পর্কে পঞ্চাশ দশকের পূর্বে তেমন কোন চিন্তা-ভাবনা না করা হলেও সম্প্রতি অধিকাংশ দেশের জাতীয় সরকার এবং শহর-প্রশাসন এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন। সমস্যাটি এড়িয়ে না গিয়ে অনেকেই এর মোকাবেলা করতে উদ্যোগী হন। প্রধানত ১৯৫০-এর পর থেকেই এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বড় শহরগুলোর বস্তি সমস্যা নিরসনের সুনির্দিষ্ট সরকারী প্রচেষ্টা গ্রহণ শুরু হয়। তখন থেকে বস্তি সমস্যা নিরসনে বা বস্তি উন্নয়নের জন্য যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে ৩টি শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায় ঃ

(ক) বস্তি উচ্ছেদ (স্লাম ক্লিয়ারেন্স) Slum Clearance

(খ) বস্তি স্থানান্তর (স্লাম রিলোকেশন) Slum Relocation

(গ) বস্তি উন্নয়ন (স্লাম আপগ্রেডিং) Slum Upgrading

বস্তি উচ্ছেদ (স্লাম ক্লিয়ারেন্স)

এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে মনে করা হয় যে, বস্তি ও বস্তিবাসী মানেই শহরবাসীদের মন্দ কিছু, বস্তি দৃষ্টিকটু এবং গণ-স্বাস্থ্যের প্রতি বিরাট হুমকি। সুতরাং যেভাবেই হোক বস্তি, বিশেষ করে অবৈধ বস্তি বা স্কোয়াটার্সকে বাস্তবিক অর্থে উচ্ছেদ করতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনে একাধারে যেমন বুলডোজার ব্যবহার করা যাবে, অগ্নি সংযোগ করা যাবে, অপর দিকে এই বস্তিবাসীদের মারধর, ধরপাকড় করে সমূলে উৎপাটন করা যাবে। এই শ্রেণীতে পুনর্বাসন ব্যবস্থা ছাড়াই বস্তিসমূহ উচ্ছেদ করা হয়ে থাকে।

বস্তি উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার ফলে বস্তিবাসীদেরকে তাদের বর্তমান ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত করা হয়, এমনকি বস্তির ভেতরকার অসংখ্য উৎপাদনশীল কারখানা ও ব্যবসায়িক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান সমূহকেও সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। এই প্রক্রিয়া কখনও এমনভাবে করা হয়ে থাকে এতে বস্তি পরিবারসমূহের সামান্য, কিন্তু তাদের কাছে মূল্যবান সম্পদও ধ্বংস করা হয়। এ ধরনের বস্তি উচ্ছেদ পদ্ধতির প্রয়োগের অন্যতম উদাহরণ ১৯৬৭ সালে কোরিয়ার রাজধানী সিউল শহরে ১,৩৬,৫০০ অবৈধ বস্তি গৃহের উচ্ছেদ অভিযান। তবে এতে সমস্যার খুব একটা স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়নি, কারণ বস্তিবাসীরা ঘুরেফিরে আবার শহরের অন্য জায়গায় ঠাই করে নিয়েছে ঠিকই। সম্প্রতি ভারতের বোম্বে শহরে এ ধরনের বস্তি উচ্ছেদ কার্যক্রম বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। আজকাল অন্য কোথাও সাধারণত এই প্রাচীন পন্থার বস্তি উচ্ছেদ পদ্ধতির মাধ্যমে বস্তি সমস্যার নিরসনের চেষ্টা করা হয় না। তাছাড়া এরকম অমানবিক পদ্ধতি গ্রহণের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের মানব-বসত সংক্রান্ত সংস্থা "হ্যাবিটাট" এবং ইউ এন এস্‌কাপ-এর সুস্পষ্ট পরামর্শ রয়েছে।[৮]

এই পদ্ধতিতে শহরের কেন্দ্রীয় এলাকার বস্তিবাসীদেরকে তাদের পুরাতন বস্তি থেকে শহরের বাইরে দূরবর্তী নতুন এলাকায় স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় স্থানান্তরিত বস্তিবাসীরা আবার শহরের কেন্দ্র স্থলেই ফিরে আসে। ফলে স্থানান্তর পদ্ধতি অকেজো হয়ে পড়ে। ১৯৫০ এর দশকে ফিলিপাইন সরকার রাজধানী ম্যানিলায় ব্যাপকহারে প্রথম এই প্রক্রিয়ায় বস্তি স্থানান্তর পদ্ধতি অনুসরণ করেন। দ্বিতীয় বৃহত্তম উদাহরণ ১৯৬০-৭০ সালের মধ্যে ভারত সরকার কর্তৃক মাদ্রাজেও প্রায় ৫৮,০০০ বস্তিবাসীকে স্থানান্তর করে শহরের বাইরে নেয়া হয়। কিন্তু নানা কারণে তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৭২ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ২৮,০০০ বাস্তুহারাকে সরিয়ে নিয়ে অতি স্বল্প মূল্যের ঘর-বাড়ি দেয়া হয়, কিন্তু কার্যক্রম বিশেষ সফল হয়নি। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককেও বস্তি স্থানান্তর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, কিন্তু ফলাফল আশাপ্রদ হয়নি। সম্প্রতি ব্যাংককে এ ধরনের স্থানান্তর পদ্ধতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী গণ-বিরোধিতা লক্ষ্য করা গেছে।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ ছাড়া বস্তি পুনর্বাসন প্রায় অসম্ভব, সুপরিকল্পিত হলে এতেও বস্তিবাসীদের মঙ্গল হতে পারে।

বাংলাদেশে বিশেষত ঢাকা শহরেও বস্তি উচ্ছেদ ও স্থানান্তর পদ্ধতি বাস্তবায়নের চেষ্টা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে তৎকালীন সরকার জরুরী আইনের আওতায় ঢাকা শহর থেকে প্রায় ২,০০,০০০ বস্তিবাসী/বাস্তুহারাকে উচ্ছেদ করে এবং এদের মধ্যে মাত্র ৭০,০০০কে ঢাকার শহরতলী এলাকায়, যেমন ডেমরার চনপাড়ায়, টংগীর দত্তপাড়ায় এবং মীরপুরের ভাসানটেকে স্থানান্তর করে। প্রথম দিকে পদ্ধতিগত কারণে কার্যক্রম সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়। স্থানান্তরিত অনেকেই আবার ঢাকায় ফিরে আসে। তবে পরবর্তীকালে কাছাকাছি এলাকায় এবং পুনর্বাসন এলাকার ভেতরেও নতুনভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় পুরাতন বাসিন্দা এবং নতুন কেউ কেউ এইসব পুনর্বাসন এলাকায় বসবাস করতে সম্মত হয়। টংগীস্থ দত্তপাড়ায় এবং মীরপুরে নতুন করে উন্নত ধরনের পুনর্বাসন কার্যক্রমের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।[৯]

বস্তি উন্নয়ন (স্লাম আপগ্রেডিং)

বস্তি সমস্যা নিরসনকল্পে সাম্প্রতিক পদ্ধতি হিসেবে এখন বস্তির স্থানীয় ভিত্তিক উন্নয়ন বা 'আপগ্রেডিং' কেই সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্লাম আপগ্রেডিং সাধারণত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বস্তি ও বৈধ বস্তিতে সম্পাদিত হলেও অনেক শহরে অবৈধভাবে গড়ে উঠা বস্তিতে বা স্কোয়াটার্স এলাকাতেও স্লাম আপগ্রেডিং ও 'রেগুলাইজেশন' কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি বস্তির অভ্যন্তরীণ ভৌত পরিবেশ ও সুবিধাদির উন্নয়ন করা হয়। যেমন রাস্তা, ড্রেন, পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা, পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ইত্যাদিসহ বস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উন্নয়ন কার্যক্রমে বস্তিবাসীদের নিজস্ব অংশগ্রহণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। এই ধরনের কার্যক্রমের ফলে সাধারণত বস্তির স্থাবর সম্পত্তির কোন রকম ক্ষতি করা হয় না, এবং এই ব্যয় সাধারণত আন্তর্জাতিক সাহায্য হিসেবে বা সরকারী অনুদান হিসেবে ব্যবস্থা করা হয়। গৃহ নির্মাণ সাধারণত পরিবারের নিজস্ব উদ্যোগে হয়ে থাকে। আপগ্রেডিং যেহেতু কাউকে স্থানান্তর করায় না, সুতরাং সকলেই তাদের পুরাতন কর্মসংস্থান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পারে,তাদের সামাজিক সংযোগও অপরিবর্তিত রাখতে পারে। এমনকি বস্তি উন্নয়নের খরচ অনেকটাই বস্তিবাসীরা নিজেরাই বহন করতে পারে।

সাম্প্রতিককালে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা ও জাম্বিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ স্লাম আপগ্রেডিং প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহিত হয়েছে'৭০ দশকে কলকাতা শহরে। এতে প্রায় ১৯ লক্ষ বস্তিবাসী উপকৃত হয়েছে। প্রায় ৫০০ কোটি রুপি ব্যয় করে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এই কার্যক্রম গৃহিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার কাম্পুং ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম, জাম্বিয়ার লুসাকা বস্তি উন্নয়ন প্রোগ্রাম, করাচীর বলদিয়া বস্তি উন্নয়ন প্রোগ্রাম, ম্যানিলার টন্ডো ফোরশোর উন্নয়ন প্রোগ্রাম, শ্রীলংকার সাম্প্রতিক মিলিয়ন হাউস প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত শহর এলাকার বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী, বস্তি উন্নয়নে আপগ্রেডিং পদ্ধতির উজ্জ্বল উদাহরণ। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে গৃহীত "কাচ্চি আবাদী রেগুলারাইজেশন" কার্যক্রম আরেকটি ব্যাপক ও বৃহদাকার উল্লেখযোগ্য বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম।[১৮] বাংলাদেশে ঢাকা শহরের লালবাগ এলাকাতেও ঢাকা পৌর কর্পোরেশন বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় শ্লাম ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে দেশের পাঁচটি শহরে-দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি ও সিলেট-স্থানীয় পৌরসভার মাধ্যমে ১৯৮৫ সন থেকে বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগের আওতায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় আরও ২০টি শহরে বস্তি উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।[১৯]

৫.০ মহানগরীর বস্তি সমস্যা এবং এর প্রকৃতি

মহানগরীর বর্তমান বস্তি ও বস্তিবাসীদের সংখ্যাধিক্য নগর জীবনে এক প্রকট সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই শহরে বস্তির অস্তিত্ব কয়েক শতাব্দীকালের প্রাচীন হলেও সাম্প্রতিককালে সমস্যাটি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে দেশে, বিশেষ করে গ্রামে, দরিদ্র লোকের সংখ্যাধিক্যের ফলে বস্তিবাসীদের তথা শহরে দরিদ্রদের সংখ্যা অব্যাহত গতিতে বেড়ে চলেছে। এ জন্য আমাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও অন্যান্য নানা কারণই হয়তো দায়ী, তবু বলা বাহুল্য যে বস্তির অসন্তোষজনক ভৌত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক পরিবেশ, বস্তিবাসীদের জন্য এবং ব্যাপকভাবে বস্তি বহির্ভূত শহরবাসী অন্যান্য নাগরিকদের জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয়। এই অবস্থার নেতিবাচক প্রভাব একাধারে বাংলাদেশ সরকারকে যেমন চিন্তিত করে তুলেছে, অপরদিকে গোটা শহরবাসীকে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে চলতে হচ্ছে।

প্রবন্ধের এই অংশে শহরাঞ্চলে বিশেষ করে ঢাকাসহ প্রধান চারটি মহানগরীর বস্তি সমস্যা ও প্রকৃতি আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। তবে ঢাকা ছাড়া দেশের অন্যান্য শহরের উপর তেমন নিবিড় গবেষণা না হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট উপাত্তের স্বল্পতার জন্য আলোচ্য বক্তব্যে ঢাকা মহানগরীর তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

তবে মহানগরীর বস্তির ভৌত পরিবেশ এবং বস্তিবাসীদের অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর পর্যাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য তথ্যাদি থাকলেও বস্তির

সংখ্যা ও বস্তিবাসী জনসংখ্যার পরিমাণ সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য তথ্য পাওয়া কঠিন। এক এক সংস্থার দ্বারা পরিচালিত জরিপের তথ্য এক এক রকম। এর একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, অধিকাংশ জরিপই অল্প সময়ের মধ্যে কিছুটা তাড়াহুড়ার মধ্যে সম্পাদন করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সংস্থা পরিচালিত জরীপ বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত হয়েছে। ফলে বস্তি কিংবা বস্তিবাসী জনসংখ্যার পরিমাণে স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নতা আসতে পারে। তৃতীয়ত, বিভিন্ন সংস্থার জরিপের এলাকার মধ্যেও অভিন্নতা ছিল না। নগর গবেষণা কেন্দ্রের ১৯৭৮, ১৯৮০ ও ১৯৮৮ সালের সকল জরিপ ছিল ঢাকা পৌর কর্পোরেশন এলাকার জন্য, অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৮৭ সালের জরিপ পরিচালনা করেছে ঢাকা স্ট্যাটিষ্টিক্যাল মেট্রোপলিটান এরিয়ার উপর ভিত্তি করে। সুতরাং এইভাবে গৃহীত জরিপের তথ্য ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। চতুর্থত, বস্তির সংখ্যা এবং বস্তিবাসী জনসংখ্যার পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভর করবে জরিপ সংস্থা পরিচালনাকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রক্রিয়া এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির ওপর।[১২] নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে আলোচ্য বিষয়ের চিত্র তুলে ধলা হলো ঃ

ক) বস্তিতে জনবসতির ঘনত্ব

শহরে এসেই প্রথমে ছিন্নমূল মানুষটি চায় সামান্য একটু মাথা গোজার স্থান। বেকার সহায় সম্বলহীন মানুষটি তখন খোঁজে সবচেয়ে সহজলভ্য সস্তা ক্ষুদ্র একটু জায়গা। সে জায়গা যেখানেই হোক। সস্তায় অতি স্বল্প পরিসরের নীচু মানের একটু জায়গাই তখন ঐ মানুষটির সবচেয়ে উপযোগী ও প্রয়োজনীয় স্থান। যেহেতু এ ধরনের মানুষের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলছে সেহেতু অতি অল্প পরিসর জায়গা নিয়ে বসবাস করে বলেই বস্তি এলাকায় জনবসতির ঘনত্ব অতি উচ্চ হয়ে থাকে। সাধারণত শহরের আবাসিক এলাকায় একর প্রতি জনবসতির ঘনত্ব চিন্তা করা হয় ৫০-২০০ জন। টংগীর দত্তপাড়া বাস্তহারা পুনর্বাসন এলাকাতেও এই ঘনত্ব ৩০০ জনের কম। অথচ ঢাকা শহরের অধিকাংশ বস্তি ও বাস্তহারা এলাকায় জনবসতির ঘনত্ব একর প্রতি ১০০০-২০০০, এমনকি ২৫০০ পর্যন্ত। এরকম অস্বাভাবিক উচ্চ ঘনত্ব রীতিমত অবিশ্বাস্যই মনে হতে পারে। নিম্নে তুলনামূলক জরিপের ফলাফল থেকে বিষয়টি উপলব্ধি এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যার ব্যাপকতার গুরুত্ব চিহ্নিত হয়েছে।

নগর গবেষণা কেন্দ্র ১৯৮৮ সালের জরিপের সময় প্রতিটি বস্তি এলাকার স্কেচ মানচিত্র ও আনুমানিক আয়তন পরিমাপ করেছে। এতে দেখা যায় ১১২৫টি বস্তির আওতায় মোট ১৩৪০ একর জমি রয়েছে অর্থাৎ একর প্রতি জনবসতির গড় ঘনত্ব হচ্ছে ৬৫৫ জন বা প্রতি বর্গমাইলে ৪১৯২০০ জন, যেখানে ঢাকার পৌর

কর্পোরেশনের এলাকাধীন শহর এলাকার গড় ঘনত্ব হচ্ছে মাত্র ৫৫,০০০ জন। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের ১৯৯৬ সালের এক জরিপে দেখা গেছে যে, ঢাকা মহানগরীর ঘনত্ব একর প্রতি ২০ (বিশ) গুণেরও বেশী। এরকম অস্বাভাবিক উচ্চ ঘনত্ব দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো সিটি, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা এবং পাকিস্তানের করাচি মহানগরী সমূহেও নেই।[১১] মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্প বস্তির মোট আয়তন মাত্র ৪৩,০০০ বর্গফুট। এই এলাকায় ১৯৯৬ সনের এক জরিপে ২৯,০০০ এর অধিক লোক বাস করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ) বস্তির ভৌত পরিবেশ

বেশীর ভাগ বস্তির ভৌত পরিবেশ অত্যন্ত নিম্নমানের। এদের মধ্যে অবৈধ বস্তি বা বাস্তহারা এলাকাগুলোর পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ। এসব এলাকার ভেতর সাধারণত পায়ে চলারও কোন নির্ধারিত রাস্তা থাকে না। আর থাকলেও তা অত্যন্ত অপ্রশস্থ। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কোন কোন বস্তিতে ২০-৪০টি পরিবারের জন্য থাকে একটি মাত্র পায়খানা। কোন কোন অবৈধ বস্তিতে হয়তো একটিও পায়খানা নেই। বস্তির ভেতর কোন পানির কল নেই এমন বস্তিও আছে। অধিকাংশ বস্তিতেই বিদ্যুৎ নেই, গ্যাস নেই, পরিসংখ্যান ব্যুরোর'৮৭ সালের জরিপ অনুযায়ী ঢাকার বস্তিবাসীদের মাত্র ৪২ ভাগ বিদ্যুৎ আলো ব্যবহার করে।[১৪] অর্থাৎ দেশের রাজধানী শহরে এক বড় সংখ্যার জনগোষ্ঠী এ জাতীয় নিম্নমান ভৌত পরিবেশে জীবন-যাপন করে।

গ) বস্তির ঘর-বাড়ির ভৌত অবকাঠামো

বস্তির ঘর বাড়ি প্রায় সবই কাঁচা এবং নিকৃষ্টমানের। ১৯৮৮ সালের জরিপ অনুযায়ী বস্তির মাত্র ১০ ভাগ ঘর-বাড়ি পাকা কিংবা আধাপাকা (পাকা ৩%, আধাপাকা ৭%)। বাকী সব কাঁচা উপকরণের (বাঁশ/টিনের/বাঁশ অথবা মুলি, ঝুপড়ি)। পরিসংখ্যান ব্যুরোর ৮৭ সালের জরিপে দেখা যায় বস্তিতে পাকা ঘর-বাড়ির পরিমাণ শতকরা ১.৯৮ভাগ।[১৫] অনেক ক্ষেত্রেই দরজার বেড়া ও টিনের চাল কিংবা বাঁশের চালের লম্বা সারি সারি ঘর করে দেয়া হয়। তার মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট কামরা বানিয়ে পরিবার ভিত্তিক ভাড়া দেয়া হয়। অবৈধ বস্তির কাঠামো আরো নাজুক। এগুলো মুলি বাশের ছাদ এবং বেড়া। বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা করার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পলিথিন দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়। এই জাতীয় বস্তির উচ্চতা সাধারণতঃ ৩-৪ ফুট যেখানে ঢোকার সময় মাথাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয় এবং ভিতরে কখনও সোজা হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

ঘ) বস্তিবাসীর বাসস্থানের পরিমাণ

বস্তিবাসীরা খুব অল্প জায়গা নিয়ে ছোট ছোট ঘরে বসবাস করে। এক তৃতীয়াংশ বস্তিবাসীই পরিবার প্রতি ৬০ বর্গফুটের বাসস্থান বিশিষ্ট ঘরে বাস করে, অর্থাৎ জনপ্রতি ১০-১৫ বর্গফুট। প্রায় ৫০% বস্তি পরিবার বাস করে ৬১-১২০ বর্গফুট আয়তনের ঘরে। বাকী ১৮-২০% এর চেয়ে বেশী (কিন্তু ৩০০ বর্গফুটের কম) জায়গা নিয়ে বসবাস করে।[১৬]

ঙ) বস্তির সংখ্যা ও বস্তির জনসংখ্যা

নগর গবেষণা কেন্দ্রের ১৯৮৮ এবং ১৯৯৬ সালের জরিপ থেকে দেখা যায়, ঢাকা পৌর কর্পোরেশন এলাকায় মোট ১১২৫টি ছোট বড় বস্তি এলাকা ছিল, এর মোট জনসংখ্যা ছিল ৮৭৮,০০। এর মধ্যে অবৈধ বস্তির সংখ্যা ছিল ৩৪১টি এবং এগুলোতে লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। বস্তির সর্বনিম্ন সাইজ ধরা হয়েছিল অন্ততঃ ১০টি পরিবার বিশিষ্ট এলাকা। তবে এর চেয়েও ছোট ছোট অনেক বস্তি ছিল। তাতে করে তখন পৌর এলাকার ভেতর মোট বস্তি জনসংখ্যা ছিল ১০০০,০০০। অর্থাৎ পৌর এলাকার মোট জনসংখ্যার ২০%। তবে অনুমান করা যায় বর্তমানে এই অনুপাত আরো বেশী হবে এবং সম্ভবতঃ তা ৩০ ভাগ। অর্থাৎ ঢাকা পৌর কর্পোরেশন এলাকায় বর্তমানে বস্তি জনসংখ্যা হবে প্রায় ১৫ লক্ষ এবং রাজউক অন্তর্ভূক্ত এলাকায় এই সংখ্যা হবে ২০-২৫ লক্ষ [১৭] ১৯৮৭ সালে সম্পাদিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপে ঢাকা মহানগরীতে বস্তির সংখ্যা ৪৮৯ এবং এগুলোতে বসবাসকারীদের সংখ্যা ৩,৩৫,৭২৩ জন। এ সংখ্যার সাথে নগর গবেষণা কেন্দ্রের অবৈধ বস্তিবাসীদের সংখ্যার মিল আছে।[১৮] বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন যে, রাজধানীমূখী জনস্রোত বর্তমান ধারায় অব্যাহত থাকলে আগামী ১০ বৎসরে ঢাকা মহানগরীর বস্তিবাসী মানুষের সংখ্যা ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে।

চ) শহরে বস্তির অবস্থান

মানচিত্রে ঢাকা মহানগরীর বস্তির বিস্তরণের ধরণ থেকে দেখা যায়, শহরের প্রায় সর্বত্রই কিছু না কিছু বস্তি রয়েছে। পৌর এলাকার ৭৫টি (১৯৮৮) ওয়ার্ডের মধ্যে একমাত্র ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড (মতিঝিল কলোনী এলাকা) ছাড়া প্রত্যেক ওয়ার্ডেই বস্তি দেখা যায়। বিশেষত লালবাগসহ পুরনো ঢাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে, আগারগাঁও, শ্যামলী, কলাবাগান, সোবহানবাগ, মোহাম্মদপুর, রায়েরবাজার, গেন্ডারিয়া, বাসাবো, মাদারটেক, খিলগাঁও, রামপুরা, মালিবাগ, তেজগাঁও, নাখালপাড়া, মহাখালী, বাড্ডা, মণিপুর, শেওড়াপাড়া, মীরপুর এমনকি বনানী গুলশানেও বস্তি আছে। রেল লাইনের দীর্ঘ এলাকা জুড়েই বস্তি। সাধারণভাবে বলা যায়, শহরের পুরাতন কেন্দ্রীয় এলাকা,

মধ্যবর্তী এলাকা, শহর সীমান্ত এলাকা এবং শহরতলী সর্বত্রই বস্তি রয়েছে। তবে যে সব জায়গায় কাজের সুযোগ রয়েছে তার কাছাকাছি জায়গাতেই বস্তি গড়ে ওঠে। চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী শহরের বস্তির অবস্থানের বৈশিষ্ট্যে উপর প্রখ্যাত ভূগোলবিদ প্রফেসর নজরুল ইসলাম ও তার সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, এই সব শহরে মিল, কলকারখানা ও সহজে কর্মসংস্থানের কাছাকাছি বস্তি গড়ে উঠেছে। এছাড়া রেল লাইন পরিত্যক্ত সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের জমির উপরে অবৈধ বস্তি গড়ে উঠেছে। এই ধারা ঢাকা ও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য মহানগরীতে বস্তি গড়ে উঠা ধারার সাথে সংগতি সম্পন্ন।[১৯] যদিও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কর্মস্থলের খুব কাছে বস্তি গড়ে উঠলে যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা সংগঠিত হতে পারে। যেমনটি ১৯৮৪ সনে ভারতের ভূপাল শহরে ইউনিয়ন কারবাইড ফ্যাক্টরীতে ঘটেছিল, এতে ২,৯৮৮ জন বস্তিবাসী মারা যায় এবং কমপক্ষে ১,০০,০০০ লোক আহত হয়।

ছ) বস্তি মালিকানার প্রকার

বৈধতা ও জমির মালিকানা অনুযায়ী বস্তির ধরন বা প্রকার চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ১৯৮৮ সালের পৌর এলাকার বস্তি জরীপে মোট বস্তির ৩৫% লোকসংখ্যা ছিল অবৈধ বস্তি বা সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জমিতে গড়ে উঠা বস্তি এবং বাকী ৬৫% বস্তিবাসী বাস করতো বৈধভাবে গড়ে উঠা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির উপর। অবৈধ বস্তির সংখ্যা চিল ৩৪৯টি। এগুলোকে বাস্তহারা এলাকা বলা যায়।[২০] ১৯৯৬ সালে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের এক জরিপে অবৈধ বস্তির হার ৪৫% এর বেশী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২১] নিম্নে ঢাকা মহানগরীরর বস্তির মালিকানার ভিত্তিতে এর প্রকার ভেদ আলোচনা করা হলোঃ

অবৈধ বস্তিঃ রেল লাইনের ধারে, রিংরোড, সোনারগাঁও রোডের মত বড় রাস্তার পাশে, আগারগাঁও এলাকার সরকারী জমিতে, পৌর কর্পোরেশন, রাজউক, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী মালিকানার অব্যবহৃত জমিতে ঘর তুলে অবৈধ বস্তিবাসীরা বসবাস করে। এরা সাধারণত ঘরে আড্ডা দেয় না, তবে অনেকেই কাউকে না কাউকে অবস্থান ফি বা জমির ভাড়া দেয়। অবৈধ বস্তি বিভিন্ন ধরনের অভিজাত সরকারী পাড়ার আনাচে কানাচেও ছোট ছোট বস্তি শ্রেণীর অবৈধ ঘর-বাড়ি গড়ে উঠেছে।

বৈধ প্রাইভেট বস্তি ঃ প্রাইভেট বা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে গড়ে উঠা বস্তি। এগুলোতে নিকৃষ্টমানের আবাসিক সুবিধা দিয়ে ঘর তৈরি করে অতি উচ্চ ঘনত্বে মেস এবং পারিবারিক বস্তি বানিয়ে ভাড়া দেয়া হয়। এসব জায়গায় ভৌত সুবিধাদি

মধ্যবর্তী এলাকা, শহর সীমান্ত এলাকা এবং শহরতলী সর্বত্রই বস্তি রয়েছে। তবে যে সব জায়গায় কাজের সুযোগ রয়েছে তার কাছাকাছি জায়গাতেই বস্তি গড়ে ওঠে। চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী শহরের বস্তির অবস্থানের বৈশিষ্ট্যে উপর প্রখ্যাত ভূগোলবিদ প্রফেসর নজরুল ইসলাম ও তার সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, এই সব শহরে মিল, কলকারখানা ও সহজে কর্মসংস্থানের কাছাকাছি বস্তি গড়ে উঠেছে। এছাড়া রেল লাইন পরিত্যক্ত সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের জমির উপরে অবৈধ বস্তি গড়ে উঠেছে। এই ধারা ঢাকা ও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য মহানগরীতে বস্তি গড়ে উঠা ধারার সাথে সংগতি সম্পন্ন।[১৯] যদিও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কর্মস্থলের খুব কাছে বস্তি গড়ে উঠলে যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা সংগঠিত হতে পারে। যেমনটি ১৯৮৪ সনে ভারতের ভূপাল শহরে ইউনিয়ন কারবাইড ফ্যাক্টরীতে ঘটেছিল, এতে ২,৯৮৮ জন বস্তিবাসী মারা যায় এবং কমপক্ষে ১,০০,০০০ লোক আহত হয়।

ছ) বস্তি মালিকানার প্রকার

বৈধতা ও জমির মালিকানা অনুযায়ী বস্তির ধরন বা প্রকার চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ১৯৮৮ সালের পৌর এলাকার বস্তি জরীপে মোট বস্তির ৩৫% লোকসংখ্যা ছিল অবৈধ বস্তি বা সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জমিতে গড়ে উঠা বস্তি এবং বাকী ৬৫% বস্তিবাসী বাস করতো বৈধভাবে গড়ে উঠা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির উপর। অবৈধ বস্তির সংখ্যা চিল ৩৪৯টি। এগুলোকে বাস্তহারা এলাকা বলা যায়।[২০] ১৯৯৬ সালে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের এক জরিপে অবৈধ বস্তির হার ৪৫% এর বেশী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২১] নিম্নে ঢাকা মহানগরীরর বস্তির মালিকানার ভিত্তিতে এর প্রকার ভেদ আলোচনা করা হলোঃ

অবৈধ বস্তিঃ রেল লাইনের ধারে, রিংরোড, সোনারগাঁও রোডের মত বড় রাস্তার পাশে, আগারগাঁও এলাকার সরকারী জমিতে, পৌর কর্পোরেশন, রাজউক, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী মালিকানার অব্যবহৃত জমিতে ঘর তুলে অবৈধ বস্তিবাসীরা বসবাস করে। এরা সাধারণত ঘরে আড্ডা দেয় না, তবে অনেকেই কাউকে না কাউকে অবস্থান ফি বা জমির ভাড়া দেয়। অবৈধ বস্তি বিভিন্ন ধরনের অভিজাত সরকারী পাড়ার আনাচে কানাচেও ছোট ছোট বস্তি শ্রেণীর অবৈধ ঘর-বাড়ি গড়ে উঠেছে।

বৈধ প্রাইভেট বস্তি ঃ প্রাইভেট বা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে গড়ে উঠা বস্তি। এগুলোতে নিকৃষ্টমানের আবাসিক সুবিধা দিয়ে ঘর তৈরি করে অতি উচ্চ ঘনত্বে মেস এবং পারিবারিক বস্তি বানিয়ে ভাড়া দেয়া হয়। এসব জায়গায় ভৌত সুবিধাদি

খুবই অপ্রতুল কিন্তু প্রতি বর্গফুট জায়গায় ভাড়া অতি উচ্চ। নগর গবেষণা কেন্দ্রের'৮৮ সালের জরিপ অনুযায়ী মহানগরীর বস্তির জমির মালিকানা প্রধানত ব্যক্তিগত (৬৫%), তবে প্রায় এক তৃতীয়াংশ (২৯%) জমির মালিক সরকার কিংবা বিভিন্ন আধাসরকারী, স্বায়তশাসিত সংস্থা, অন্যান্য ধরনের মালিকানা বা মালিকানা স্বত্ব সুনিশ্চিত নয় এমন বস্তি বাকী ৬ ভাগ।[২২] উপর্যুক্ত একই জরিপে চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী শহরের মালিকানার ধরন বিপরীত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। অর্থাৎ ঢাকা মহানগরীর চেয়ে এই সকল শহরে অবৈধ বস্তির হার ৭৫ ভাগের উর্ধ্বে।

জ) বস্তিবাসীদের ঘর ভাড়ার ধরন

অবৈধ বস্তিতে, অর্থাৎ বাস্তহারা এলাকাগুলোতে, সাধারণত ঘর ভাড়া দেয়া লাগে না। তবে জমিতে ঘর তোলার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এক ধরনের 'মাস্তান ফি' অথবা জমির ভাড়া দিতে হয়। ঢাকা জেলা প্রশাসকের দফতরে সাম্প্রতিক, ৮৯ জরিপ অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ বস্তিবাসী মাস্তানদের ভাড়া প্রদান করে।[২৩] তবে সামগ্রিকভাবে শহরের প্রায় এক পঞ্চমাংশ বস্তিবাসী ঘরের কোন ভাড়া দেয় না অর্থাৎ এরাই বাস্তহারা এবং নিজের ঘর (বা ঝুপড়ি) নিজে করে নিয়েছে। বাকী সবাই ঘর ভাড়া করে থাকে এবং প্রায় ৫০ ভাগ বস্তিবাসী প্রতিমাসে ঘর বা কামরা ভাড়া হিসেবে ২০০ টাকার বেশী দেয় এবং ২০% বস্তি পরিবার ৩০০ টাকার উপর ভাড়া দেয়, সর্বোচ্চ একটি বস্তি কামরার ভাড়া ৫০০-৬০০ টাকাও হতে পারে। দরিদ্র বস্তিবাসীরা কাঁচা ঘরের জন্যেও প্রতি বর্গফুটে গড়ে ৪ টাকার মত ভাড়া দেয় এবং অন্তত ৮ শতাংশ বস্তিবাসী প্রতি বর্গফুটে ৫ টাকার উপর ভাড়া দিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত এলাকার প্রথম শ্রেণীর সকল সুযোগ সুবিধাসহ পাকা বাড়ির ভাড়া হয় সাধারণত প্রতি বর্গফুটে ৩-৪ টাকা মাত্র। কমপক্ষে ১৫.০% বস্তির পরিবার তাদের মোট মাসিক আয়ের ২০ ভাগেরও বেশী খরচ করে ঘর ভাড়া হিসেবে। প্রায় ৩৪.০% বস্তি পরিবার আয়ের ১০-২০ শতাংশ খরচ করে ঘর ভাড়া হিসেবে।[২৪]

ঝ) বস্তিবাসীদের কর্মস্থলের দূরত্ব ও যাতায়াতের ব্যবস্থা

ঢাকার বস্তিবাসীরা কাজের জায়গার কাছাকাছি কোথাও আশ্রয় সংস্থান করে নেয়। প্রায় ৭৫ ভাগ বস্তিবাসীই কাজের জায়গা থেকে ১ মাইলের মধ্যে বসবাস করে। আরো ১৫ ভাগ ২ মাইলের মধ্যে, বাকীরা এর বেশী দূরত্বে। কাছাকাছি থাকার কারণে পায়ে হেঁটে অল্প সময়ে এবং প্রায় বিনা খরচে কর্মস্থলে পৌঁছানো যায়। ঢাকার কর্মজীবী বস্তিবাসীদরে শতকরা ৭০ জন পায়ে হেঁটেই কাজে যায় বলে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে।[২৫]

৬.০ বস্তিবাসীদের পেশা ও শহর উন্নয়নে তাদের অর্থনৈতিক ভূমিকা

বস্তিবাসীরা প্রধানত শ্রমজীবী মানুষ প্রাপ্ত বয়স্ক ও নারী, কিশোর-কিশোরী এমনকি শিশুও। এদের এক বিরাট অংশ রিক্সা ও বিভিন্ন পরিবহনের চালক ও মেরামতকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র শ্রমিক, গার্মেন্টস শিল্পের মহিলা শ্রমিক, দোকানের কর্মচারী, হোটেল, রেস্তোরার কর্মচারী, ঘরে ঘরে ফেরী করা সহ নানা ধরনের ছোট ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি। সড়ক ও ভবনাদির জন্য নির্মাণ শ্রমিক, নানা রকম দক্ষ ও আধা দক্ষ কর্মী, সাধারণ দিনমজুর ও মুটে, নানা রকম সরকারী, আধা সরকারী, প্রাইভেট অফিস-আদালতে নিম্ন পর্যায়ে নিযুক্ত চাকুরীজীবী, পারিবারিক বা গৃহকর্মে নিযুক্ত পূর্ণ সময় কিংবা খন্ডকালীন পরিচারিকা, আয়া, ঝি, মালী, দারোয়ন ইত্যাদি। অনেক শিশু এমনকি বয়স্করাও শহরের আবর্জনা ও ফেলে দেয়া জিনিসপত্র কুড়িয়ে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে যাদেরকে আমরা সবাই টোকাই বলে চিহ্নিত করি। অনেকে আবার এইসব আবর্জনা জাতীয় দ্রব্যাদির রিসাইক্লিং-এর কাজে নিযুক্ত। অর্থাৎ এরা সবাই আইন সঙ্গত শ্রমশীল কাজে নিয়োজিত। বস্তিবাসীদের মধ্যে সংখ্যক লোক অবশ্য নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপেও লিপ্ত। ভিক্ষুক, দেহপসারিণী, কালোবাজারী, স্মাগলার, পকেটমার, চোর, হাইজ্যাকার ইত্যাদি পেশাভুক্ত লোক নিশ্চয়ই আছে। তবে তুলনামূলকভাবে অবৈধ পেশাধারীদের সংখ্যা সমগ্রের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

সামিগ্রকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে বস্তিবাসীদের অধিকাংশই দেশের শহরে অত্যাবশ্যকীয় সেবামূলক ও উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত। যদিও এরা যে খাতে নিয়োজিত তাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বা ইনফরমাল সেক্টর না বলে এদেরকে ক্ষুদ্র উৎপাদন খাত বা ক্ষুদ্র সেবা খাত হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। শহরের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষেত্রে এদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শহরের উচ্চ ও বৃহদাকার পর্যায়ের শিল্প উৎপাদনের সাথে সংযুক্ত ছোট ছোট কারখানা শ্রমিক ও মালিক হিসেবেও এরা বিরাট অবদান রাখছে। অর্থাৎ শহরের প্রডাকশন লিংকেজ, সার্ভিস লিংকেজ এবং ট্রেড লিংকেজ-এ বস্তিবাসী দরিদ্রদের ভূমিকা অসামান্য। সবেচেয় বড় কথা বস্তিবাসীরা সাধারণত নিজেদের কর্মসংস্থান নিজেরাই করে থাকে, এক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের নিয়মাবলীর জটিলতা নেই।

৭.০ বস্তি সমস্যা সমাধানে সুপারিশসমূহ

পূর্বেই বলা হয়েছে গ্রাম থেকে শহরে জীবিকার অন্বেষণে ছিন্নমূল মানুষের আগমন একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। এই অভিবাসন প্রক্রিয়া অতীতেও ছিল, বর্তমানেও চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে। আমাদের দেশে নগরকেন্দ্রিক কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিকাশের ফলে এই প্রক্রিয়া সম্প্রতি আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক, ইউএনইপি এবং ইউএনডিপি এর 'ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ১৯৯৭-৯৮ শীর্ষক যৌথ প্রকাশনায় দেখানো হয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশ সমূহে প্রতিদিন গড়ে ১,৫০,০০০ লোক শহর অভিমুখী হচ্ছে। এই প্রকাশনার ভাষায় এটাকে একটি অপ্রতিরোধ্য প্রক্রিয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৬]

তবে এই ধাবমান স্রোতের গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তনে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিওর সহায়তায় এই সমস্যা সমাধানে নানা প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। বর্তমান প্রবন্ধে বস্তি সমস্যার যে সকল মৌলিক দিক এবং বিভিন্ন গবেষণা জরিপের ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বস্তি সমস্যার সমাধান ও এর উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রাসংগিক বলে বিবেচনা করা যায় ঃ

(ক) বস্তি সমস্যা সুস্থ নগরায়নের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে প্রতিহত করছে, এজন্য এ সমস্যাকে জাতীয় আবাসিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সেই আলোকে একটি জাতীয় আবাসন নীতি প্রণয়ন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। এই নীতিতে বস্তি বাসীদের জন্য একটি বিশেষ আর্থিক ঋণ দেয়া আবশ্যক যাতে করে এই ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে একাধারে সরকার নির্ধারিত স্থানে স্বল্প ব্যয়ে একটি আবাসনের সুযোগ পেতে পারে, অপরদিকে স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে একটি কাজের সুযোগ পেতে পারে। হংকং এবং সিউলসহ তৃতীয় বিশ্বের বহু শহরে বস্তি বাসীদের এমন সুযোগ প্রদানের নজীর রয়েছে।

(খ) গ্রামীণ ব্যাংক এর অনুকরণে শহরে বস্তি বাসীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং প্রকল্প গ্রহণের জন্য "বস্তিবাসী ব্যাংক" প্রথা প্রবর্তন করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইউনিসেফ, বিশ্ব ব্যাংক, সুইডিশ সিডা এবং নোরাড এর সহায়তায় ঢাকাসহ দেশের ২৫টি শহরে/পৌর এলাকায় ৪৫,০০০ বস্তি পরিবার উন্নয়নের জন্য ৯টি বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই সকল প্রকল্পের মধ্যে একটি প্রকল্প মূলত ১,৫০০ জন বস্তি মহিলাদের সমন্বয়ে ছোট ছোট দল গঠন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে 'বস্তিবাসী ব্যাংক সৃষ্টি' এবং গ্রামীণ ব্যাংকের অনুকরণে ঋণ প্রথা চালু করতে চাইলে সম্ভবত উপর্যুক্ত দাতা সংস্থার পক্ষ হতে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে।

(গ) সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছা ব্যতীত এ ধরনের জাতীয় সমস্যার সমাধান উন্নয়নকমী দেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রণয়ন ও

বাস্তবায়ন মোটেই সম্ভব নয়। এ জন্য বস্তি সমস্যাকে শুধু একক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেই মুল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দরিদ্রতা, বেকারত্ব ও অশিক্ষার মত জাতীয় সমস্যাকে গ্রাম ও শহরে একসাথে সমান গুরুত্বের সাথে সমাধা না করে শুধু শহরে বস্তি বাসীদের জন্য এ ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করলে গ্রামের ছিন্নমূল লোকের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বহুলাংশে বেড়ে যাবে। এজন্য এই সমস্যাটি গ্রাম এবং শহরে একত্রে বিবেচনা করতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি পৌর সভায় একটি বস্তি উন্নয়ন ও স্বল্পতায় আবাসন বিভাগ গঠন করা যেতে পারে। বাংলাদেশের মত স্বল্প উন্নত দেশে সরকারের পক্ষে যেহেতু এককভাবে বস্তি সমস্যা সমাধানসহ সামগ্রিকভাবে স্বল্প-আয় আবাসন নিরসন সম্ভব নয়, এজন্য ব্যক্তিমালিকানা উদ্যোগে স্বল্প আয় সম্পন্ন লোকের জন্য আবাসিক সুযোগ সৃষ্টিকে উৎসাহিত করতে হবে। সরকার ইতিমধ্যে আবাসনকে একটি শিল্প হিসেবে বিচেনা করেছেন, এ কারণে এই শিল্পে অর্থাৎ স্বল্প আয় আবাসন শিল্পে বিনিয়োগ সম্প্রসারিত করতে হবে। উল্লেখ্য, ঢাকা মহানগরীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে ব্যক্তিমালিকানায় বিভিন্ন আবাসিক প্রকল্প তৈরী হচ্ছে কিন্তু এই সকল আবাসন সুবিধা বস্তিবাসী বা স্বল্প আয় সম্পন্ন লোকের জন্য একটি উদ্যোগও দেশে এ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। এজন্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক গৃহ নির্মাণ ও রিয়েল এষ্টেট কোম্পানীকে বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম উন্নয়নে উৎসাহিত করতে হবে।

ঙ) বস্তি সমস্যা নিরসনে ও বস্তি উন্নয়নে দাতা সংস্থাসমূহ এবং দেশের বিভিন্ন এনজিওকে আরো বেশী অবদান রাখার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

৮.০ উপসংহার

বস্তিবাসীদের অধিকাংশই দেশের বিভিন্ন শহর গুলোতে নির্মাণ, শিল্প, কলকারখানা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত। এদের পরিশ্রমের ফলে শহরের প্রতিটি সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সচল হয়ে আছে। মোট কথা একটি শহরের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাদের পরিশ্রমের বদৌলতে আমাদের শহরগুলো সচল থাকছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সরকার সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ফলে একদিকে যেমন সূচিত হবে ছিন্নমূল মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন, অপরদিকে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে করবে আরো শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ।

শহরমুখী জনস্রোত প্রতিহত না করা গেলে, শহরের হত দরিদ্র ও ভাসমান মানুষের যথাযথ পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না নেয়া হলে, আগামী কয়েক বৎসরের

মধ্যে আমাদের দেশের রাজধানী ঢাকাসহ সকল বড় বড় শহরগুলো সুস্থ, উন্নত জীবনবাসের অনুপেযোগী হয়ে পড়বে। এটা নিছক আশংকা নয় অভিজ্ঞতা লব্ধ বোধ ও দূরদর্শিতাজাত মন্তব্য। বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষা জরিপে একথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। তাই এ সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। আর নেই বলেই আমাদের আরও সচেতন হতে হবে, সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই আলোকে বাস্তব সম্মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য গ্রাম ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এমনভাবে, যাতে করে বৎসরের মাত্র কয়েকদিন কর্ম-সংস্থানের পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচির ব্যবস্থা থাকে। সর্বোপরি শহর মুখী প্রবণতা প্রতিরোধ কল্পে গ্রামে গ্রামে প্রসারিত করতে হবে শহরের সুযোগ সুবিধা, যাতে গ্রামের মানুষ গ্রামে থেকেই বেঁচে থাকার জন্য একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে। এরূপ একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা গেলে গ্রামের মানুষ গ্রামেই থাকতে চাইবে। ফলে গ্রাম থেকে শহরে আগমন প্রত্যাশিত মাত্রায় ঘটবে এবং একটা ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করবে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. United Nations, (1994) *World Urbanization Prospect* : New York.
2. Urban Development Directorate, (1974) *Squatters in Bangladesh Cities: A Survey of Urban Squatters in Dhaka.* Chittagong and Khulna, Dhaka University.
3. Nazrul Islam, (1976) *Squatters in Dhaka City; Center for Urban Studies.*
4. Ibid., P.123.
5. World Bank, (1991) *World Development Report.* 1991
6. Bangladesh Bureau of Statistics, (1991) *Bangladesh Population Census Report.*
7. Ibid. 48
8. Nazrul Islam, (1995) *"Urbanization and Urban Environment in Bangladesh"* in A Atiq Rahman et al edited, Environment and Development in Bangladesh, BCAS.
9. Ibid., P.335
10. Ibid., P. 339

11. United Nations, (1991) *Population of Bangladesh*. Country Monograph Series No.8, ESCAPE.

12. Ibid., PP. 23-34

13. Nazrul Islam, (1987) *"The Poor's Access to Residential Space in an unfairly structured* city Dhaka, in Oriental Geographers, Vol. 24, Vol.1.

14. Nazrul Islam and Amanatullah Khan, (1988) *"Increasing and Absorptive Capacity Asia: A Case study of Dhaka.* Bangladesh", in Regional Development Dialogue, Vol.9, No.4.

15. A. Minur Khan, (1990) *"Slums in Dhaka City"* Oriental Geographers, Vol. 25, No.172.

16. Ministry of Land, (1989) *Committee Report on the Problems of Squatters settlement of Dhaka City.*

17. Ibid., P. 15

18. Ibid., P. 39

19. Ibid., P.66

20. UNICEF, (1994) *Evaluation Study of slum Improvement Project.* LGED.

21. OP cit. 28.

22. Op. cit. 45.

23. ADB, (1996) *Urban Poverty Reduction Project LGED.*

24. World Bank, (1996) *World Resources 1996-97.* Oxford University Press.

25. Nasreen Khandaker et al. (1994) *"Urban Poverty in Bangladesh : Trends, Determinants and Policy Issues"* in Asian Development Review Vol. 12, No.1.

26. A. Q. M Mahbub & Nazrul Islam. (1991) *"The Growth of Slums in Dhaka City : A Spatio-Temporal Analysis"* in Sharifuddin Ahmed (edited) Dhaka : Past Present & Future,Asiatic Society of Bangladesh.

27. Ibid. P. 517.